রাগ, অনুরাগ

নিরাপত্তা ও নৈতিকতা

আলম খোরশেদ

বাংলাদেশের আপাত শান্ত রাজনৈতিক আবহ হঠাৎ করেই আবার বুঝি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে চাইছে। ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক প্রস্তাবিত বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ও তার নিকটতম আত্মীয়দের আজীবন নিরাপত্তা বিষয়ক একটি আইন প্রণয়নকে কেন্দ্র করে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ও তার নেতৃত্বাধীন মোর্চার অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহ খুবই ক্ষীপ্ত। তাদের সঙ্গে সমস্বরে গলা মিলিয়েছেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী তথাকথিত বুদ্ধিজীবী আর পেশাজীবীদের দল। এই আপাতনিরীহ এবং দৃশ্যত মানবিক একটি ইস্যুকে নিয়ে তারা নির্বাচন পূর্ববর্তী পরিবেশকে শুধু বিষিয়েই তুলছেন না, খোদ নির্বাচন বয়কটের একটি মৃদু হুমকিও উচ্চারণ করে ফেলেছেন তাদের এক সিনিয়র নেতা। বর্তমানে প্রস্তাবিত আইনটি খসড়া পর্যায়ে রয়েছে। তার ভেতরের বিষয়বস্তু সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত তেমন কিছু জানা যায় নি। তো এইভাবে একটি অনুত্থাপিত বিলের বিশদ না জেনে তার আগাম বিরোধিতা করার স্রেফ দুটো কারণই থাকতে পারে। এক : তারা শেখ হাসিনার নিরাপত্তা বিষয়ে মোটেও ভাবিত নন বরং তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে তৎপর, দুই : নির্বাচনে পরাজয়ের আশঙ্কায় তারা কোন একটা ছুতো তুলে নির্বাচন বানচালের পাঁয়তারা করছেন। এছাড়া এর আর কোন কারণ কিংবা যৌক্তিকতা বর্তমান লেখকের কাছে স্পষ্ট নয়। এই বিষয়টিকে দলীয় রাজনীতি থেকে আলাদা করে নির্ভেজাল মানবিক দৃষ্টিকোণ এবং বাস্তব প্রেক্ষাপট থেকে বিচার করা উচিত সকলের। কেন? সেটা ব্যাখ্যা করাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

আলোচ্য বিষয়টির দুটো দিক রয়েছে; একটি সাধারণ, অন্যটি বিশেষ। সাধারণ দিকটা এই যে যখন কোন সরকার প্রধানের ক্ষমতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায় তখন তিনি সাধারণ নাগরিকে পরিণত হলেও তার নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তার কারণ সরকার প্রধান থাকাকালীন তাকে এমনকিছু নীতিমালা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়ে থাকতে পারে, যা কোন ব্যক্তি কিংবা মহলকে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ করতে পারে। তো সেই ক্ষতিগ্রস্ত, ক্ষুব্ধ, স্বার্থে আঘাত লাগা ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধপরায়ন হয়ে সেই সরকার প্রধানের ওপর পাল্টা আঘাত হানতে পারে তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর। এই সম্ভাব্য বিপদের কথা ভেবেই পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই প্রাক্তন রাষ্ট্র প্রধানদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিধান রয়েছে। এই সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানরা তাই বিশেষ নিরাপত্তার দাবীদার হতেই পারেন। সত্যি বলতে কি বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রে, যেখানে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও প্রতিহিংসার রাজনীতি অত্যন্ত প্রবল, এই ব্যবস্থা ও বিধানের যৌক্তিকতা বরং অন্য যে কোন দেশের চাইতে বেশি।

এবারে আসা যাক বিষয়টির বিশেষ দিকটির ওপর। সেটি বিশেষভাবে শেখ হাসিনার মতো একজন সরকার প্রধানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কিত। একথা সকলেরই জানা যে ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে ঠিক এই বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবের কারণেই সেদিন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর পিতা বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার শেখ মুজিবুর রহমান একদল প্রতিহিংসাপরায়ণ, উচ্ছৃংখল সেনা অফিসারের হাতে সপরিবারে নিহত হন নির্মমভাবে। ঘটনাচক্রে সেই কালরাত্রিতে তার দুই কন্যা দেশের বাইরে অবস্থান করাতে প্রাণে বেঁচে যান, তা নাহলে ঘাতকের বুলেটের কবল থেকে তারাও রেহাই পেতেন না, কেননা তাদের উদ্দেশ্যই ছিল মুজিব পরিবারকে একেবারে সবংশে নির্মূল করে দেয়া যাতে করে ভবিষ্যতে তাদের কেউ আর এই হত্যাকাণ্ডের বিচার ও অপরাধীদের শাস্তি দিতে না পারে। কিন্তু খুনীদের সেই আশা পূর্ণ হয় নি। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর, নিয়তি নির্ধারিত গ্রীক নাটকের ধারায় আজ সেই খুনীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে আর সেই ঐতিহাসিক দায়িত্বটুকু পালন করেছেন আর কেউ নয় সেদিনের বেঁচে যাওয়া মুজিব তনয়া শেখ হাসিনা, যিনি নির্বাসন থেকে দেশে ফিরে গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত হয়ে ঘাতকদের রক্ষাকারী কালাকানুন ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হত্যার বিচার শুরু করেন। সেই বিচার প্রক্রিয়া আজ শেষ পর্যায়ে এবং গ্রেপ্তারকৃত আসামী খুনীরা সর্বোচ্চ শাস্তির মুখোমুখি।

এমতাবস্থায় শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা যে প্রচণ্ড এক হুমকির সম্মুখীন সে কথা কোনো অর্বাচীনেরও বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। আর এই হুমকি যে স্রেফ মনগড়া, কল্পনা নয় সেটা গত কিছুদিন ধরে তাকে হত্যা করার নানাবিধ প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রেই প্রমাণিত। কোটালিপাড়ায় তার জনসভায় বোমা পুঁতে রাখা, ইসরাইলি গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফাঁস করে দেয়া হল্যাণ্ডের মাটিতে মুজিব হত্যাকারীদের সভা ও হাসিনা হত্যার নীল নকশার খবর, সম্প্রতি ঢাকার এক হোটেল থেকে ঘাতকদের সংগঠন ফ্রীডম পার্টির সদস্য জনৈক প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তাকে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র সন্দেহে গ্রেপ্তার ইত্যাদি নানা আলামতে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে পলাতক ঘাতকেরা এবং বন্দী ঘাতকদের প্রতি সহানুভূতিশীল একটি মহল মরিয়া হয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের পথের কাঁটা হাসিনাকে চিরতরে সরিয়ে দিতে। প্রধানমন্ত্রীত্বের সুবাদে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বর্ষার মেঘ, মনের মেঘ, দুর্যোগের মেঘ

আনিসুল হক

বাংলাদেশে এখন বর্ষাকাল।

আকাশ খোসা-ছাড়া লিচুর মতো, ধূসর, মেঘে-ঢাকা, বৃষ্টি নামছে যখন-তখন। বৃষ্টি বেশি হওয়ার দরকার নেই, পানিতে থইথই করছে রাজপথ, গলিউপগলি। রাস্তা জুড়ে বড় বড় গর্ত খোঁড়ার কাজও চলছে অবিরাম। এই যে বর্ষার সঙ্গে অপূর্ব যোগ রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির, এর কারণ হল বাংলাদেশে অর্থবছর শেষ হয় জুন মাসে। বরাদ্দ অর্থ ফেরৎ যাবে, যদি না জুন মাসেই সেটা ব্যবহার করে ফেলা হয়। তাই বাংলাদেশে জুন মাসে উন্নয়ন কার্যক্রমের প-াবন বয়ে যায়। ওয়াসার মনে পড়ে যায় স্টর্ম সুয়েরেজ বানানোর কথা, টিএন্ডটির মনে পড়ে ভূগর্ভস্থ কেব্‌ল স্থাপনের গুরুত্ব, তিতাস গ্যাসের মনে পড়ে পাড়ায় পাইপ এবার মোটা না করলেই নয়। একবার নাকি ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে রেডিও-র রানিং কমেন্টেটর ভুল করে বলে ফেলেছিলেন, কর্দমাক্ত আকাশ, মেঘাচ্ছন্ন মাঠ। সত্যি বর্ষায় ঢাকা শহর খোঁড়াখুঁড়ির প্রাবল্যে এমন হয়ে পড়ে যেন আকাশকেও তা কর্দমাক্ত করে ছাড়বে। আমরা ঢাকাবাসী তাই বর্ষাকে বাংলা বর্ষপঞ্জী অনুসারে চিনি না, চিনি ঢাকার রাস্তায় 'উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলিতেছে' অঙ্কিত সাইন দেখে।

ঢাকায় আবারও বর্ষা এসে গেছে। ঢাকায় এখনও কিছু কদম গাছ অবশিষ্ট আছে, সেসবের নিচে কৃষ্ণ বাঁশি বাজান না বটে, তবে গাছে গাছে আজও কদম ধরে, ঘন কালচে সবুজ সতেজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে সোনার দলার মতো একেকটা কদম ফুল, তার কী সুন্দর মিহি স্বর্ণসূঁচের মত পাপড়ি! এখন রমনার আশেপাশে টোকাই বালকের হাতে হাতে কদম ফুলের তোড়া, দু'দশ টাকায় সহজেই কিনে ফেলা যায়। আমাদের ঢাকা শহরের বাতাস সারাটা বছর থিকথিক করে ধোঁয়ায়, সীসায়, কার্বনে, সালফারে, কার্বন-মনো-অক্সাইড গ্যাসে, আর নানা ভাসন্ত কণায়। এর থেকে আমাদের পরিত্রাণ নেই, কেবল বর্ষা ছাড়া। বৃষ্টি-ধোওয়া-বাতাস এখন অনেকটাই নির্মল। দূরে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণচূড়া গাছ, লাল হয়ে আছে ফুলে, আহ, সারাটা বছর যদি এমন থাকত!

ঢাকায় কি এখনও ব্যাঙ ডাকে? সোনালি রঙের বড়বড় ব্যাঙগুলো, বর্ষার পানি মাঠে জমা মাত্রই মাঠ ছাপিয়ে যাদের মেলা বসত, এত বড় বড় ব্যাঙ সব কোথায় ছিল এত দিন, এক যোগে ডাকতে শুরু করেছে, ঘ্যা-ঘো। আমি অবশ্য ঢাকায় এখনও ব্যাঙের ডাক শুনতে পাইনি, তবে যারা বাড্ডায় বা বাসাবোয় থাকেন, তারা বলছেন, আজো নাকি ব্যাঙের ডাক তারা শুনতে পান!

ব্যাঙের ডাকের কিন্তু একটা ঝিমধরানিয়া সুর আছে। একযোগে যখন অনেকগুলো ব্যাঙ ডেকে চলে, তখন আর আলাদা করে সেটা শুনতে হয় না, একটানা বাজতে থাকে, অভ্যাস হয়ে যায়। একবার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার মৌসুমে এক ছাত্র রাতের বেলা হলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হুস-হুট শব্দ করে কী যেন তাড়াতে লাগল। অন্য ছাত্ররা তাকে জিজ্ঞেস করল, ঘটনা কী? তুমি কী তাড়াও?

'ব্যাঙ ডাকছে। পড়ায় ডিস্টার্ব হচ্ছে।' ছেলেটা জানালো। তখন পুরো হলের ছাত্রদের মাথায় এলো, তাই তো ব্যাঙ ডাকছে বলে তো পড়ায় ডিস্টার্ব হচ্ছে। আরো অনেক ছেলে লেগে পড়লো ব্যাঙ তাড়াতে।

ঈলিশ কিন্তু এখনও ঢাকার বাজারে তেমন করে ওঠেনি। এ এক রহস্যই বটে, ঈলিশ সব গেল কোথায়? বর্ষাকালে মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের কর্তা তার বড় মাছ কেনার শখ চরিতার্থ করতে মোটামুটি সস্তায় কিনে আনবেন একজোড়া বড় আকারের ঈলিশ, আর সেই একই মাছ জ্বাল দিয়ে খেতে খেতে শেষের দিকে অভক্তি ধরে যাবে ঈলিশের প্রতি, এ ঘটনা বোধ হয় আর ঘটবে না। ঈলিশ নাকি রপ্তানি হয়ে যায়, প্রধানত ভারতে। কথা কি ঠিক? নাকি চোরাচালান হয়ে যায়? যাই হোক না কেন, ঈলিশ এখন বাংলার ঘরে ঘরে এক নস্টালজিয়ার নাম।

তবুও বর্ষা যখন এসেই গেছে, জানালা দিয়ে তাকালে দেখা যাচ্ছে গাছের পাতাগুলো বৃষ্টিতে আর ঝোড়ো হাওয়ায় কাঁপছে, আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কঠোর নির্দেশ- ঢাকা শহরে লোড শেডিং দেওয়া যাবে না- তাকে উপেক্ষা করে শহরে দিনে পাঁচবার করে বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে, তখন একটু খিচুড়ি আর ঈলিশ ভাজা গরম গরম কি হয়ে যেতে পারে না? তা দাম যতই ধরাছোঁয়ার বাইরে যাক, গিন্নির জমানো টাকা ভাঙিয়ে হলেও ঈলিশ একটা ঘরে আনতে তো হবেই।

এবারের বর্ষায় ঢাকা আরেকটা বাৎসরিক আয়োজন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেটা হলো বাজেট-উত্তর আন্দোলন। জুনে প্রতি বছরই বার্ষিক জাতীয় অর্থ বাজেট ঘোষিত হয়, আর তার গণবিরোধী চরিত্রের প্রতিবাদে প্রতি বছরই পালিত হয় প্রতিবাদ-বিক্ষোভের নানা কর্মসূচি। হরতালও ডাকা হয়। এ-বছর বলতে হবে তার ব্যতিক্রম, এবার বিরোধী দল বাজেটকে গণবিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করলেও হরতাল ডেকে বসেনি। কারণ সামনে নির্বাচন, এখন আর হরতাল ডেকে মানুষকে বিরক্ত করাটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করবে না।

ঢাকায় এখন ব্যাঙের মন্ত্র-মধুর ব্যাঙের ডাক শোনা না গেলেও রাজনীতিবিদদের একটানা কথামালা কিন্তু বেজেই চলেছে। সংসদ বসছে, তাতে নানা ধরনের বক্তৃতা চলছে। সেসব আর দেশের মানুষ যে খুব কান পেতে শোনে, তা নয়। এমন কি প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে বক্তৃতা দিলেন, মানুষের তাতে আগ্রহ নেই। আগ্রহ যেমন নেই, তেমনি কোনো প্রতিক্রিয়াও নেই। হঠাৎ করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাঙ-তাড়ুয়া ছাত্রের মত যদি কেউ মনে করিয়ে দেয়, ওই যে ওই লোকের কথায় আমাদের ডিস্টার্ব হচ্ছে, তখনই মানুষ কেবল বিরক্ত হয়, প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

এদিকে নতুন আইন হতে যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আর শেখ রেহানার জন্যে আজীবন স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স আর সরকারি বাড়ি দিয়ে নিরাপত্তা যোগাবে রাষ্ট্র। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বেষ্টনির কড়াকড়ি নিয়ে এরই মধ্যে এসএসএফের সঙ্গে একজন জেলা প্রশাসকের গোলযোগ হয়ে গেছে চট্টগ্রামে। এসএসএফের কড়াকড়ি নিয়ে একাধিকবার আপত্তি

(১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রবন্ধ

বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশীদের করণীয় প্রসঙ্গে

বদরুদ্দীন উমর

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ অঞ্চলের বাঙালীদের জন্য যে সব সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে একটা বড় রকম সুযোগ হলো বাংলাদেশের বাইরে গিয়ে জীবিকার সন্ধান করা ও জীবিকা অর্জন করা। এ কারণে ১৯৭১ সাল থেকে লক্ষ লক্ষ বাঙালী সারা বিশ্বে এখন ছড়িয়ে বসবাস করছে। ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ইত্যাদি সকল দেশেই এখন বাঙালীদের উপস্থিতি।

এই বাঙালীদের মধ্যে সকলেই যে এক ধরনের কাজ করে জীবিকা নির্বাহের জন্য তা নয়। এঁদের অধিকাংশই শারীরিক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। কিন্তু ছোট হলেও একটি অংশ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিল্প সংস্থায় বিশেষজ্ঞ অথবা উচ্চ প্রযুক্তি ক্ষেত্রের কর্মী হিসেবে কাজ করেন। এছাড়া আরও নানা প্রকার কাজের সাথে তাঁরা অনেকেই যুক্ত থাকেন।

এই সব কাজের সাথে যুক্ত থাকার কারণে বিদেশে বসবাসরত এই শিক্ষিত বাঙালীরা ইংরেজী তো বটেই, এছাড়া ফরাসী, জার্মান, রুশ ইত্যাদি ইউরোপীয় ভাষা, চীনা ও জাপানী ভাষা, আরবী, ফারসী ভাষা ইত্যাদিতে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছেন। এ রকম ভাষা জ্ঞান সম্পন্ন বাঙালীর দেখা যে দেশেই যাওয়া যায় সেখানেই পাওয়া যায়।

এই বাঙালীরা নিজেদের জীবিকা অর্জন ও ভাগ্য উন্নয়নের জন্য দেশ ছাড়লেও দেশের প্রতি স্বাভাবিকভাবে তাঁদের একটা মমতা ও টান আছে। এঁদের অনেকেই দেশের জন্য এমন কিছু একটা করতে চান যাতে দেশের জনগণের উপকার হয়। এঁদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষিত এবং যাঁরা বাংলা ছাড়া কোন না কোন বিদেশী ভাষায় মোটামুটি অথবা ভালোভাবে দক্ষতা অর্জন করেছেন তাঁদের জন্য বড় রকম একটা কাজের ক্ষেত্র হলো বিদেশী ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করা এবং বাংলা থেকে বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করা।

এই অনুবাদের কাজটির ওপর আমাদের দেশের কোন সরকারীই কোন রকম গুরুত্ব দেয় নি। এদেশের শিক্ষিত লোকজন, এমনকি শিক্ষকরাও এর গুরুত্ব বিশেষ একটা বোধ করেন না। কাজেই বিদেশে বসবাসরত বাঙালীরা এ বিষয়ে কোন করণীয় তাঁদের আছে কিনা সেটা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই কোন চিন্তা করেন না।

অথচ বিষয়টি আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭২ সালে বাংলাকে নিম্নতম থেকে একেবারে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম করা হয়েছে। কিন্তু কোন ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার অর্থ শুধু সেই ভাষায় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে বক্তৃতা দেওয়া এবং পরীক্ষার খাতায় সেই ভাষায় উত্তর লেখা নয়। এর মূল অর্থ হলো, সেই ভাষায়, এ ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায়, রচিত বইপত্রের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ। বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে শিক্ষার মাধ্যম করা হলেও বাংলা ভাষায় শিক্ষার জন্য সে রকম কোন ব্যবস্থা সরকারীভাবে করা হয়নি। বেসরকারীভাবে কোন উদ্যোগও এ পর্যন্ত তেমন গ্রহণ করা হয়নি যা প্রয়োজনের তুলনায় উলে-খযোগ্য।

কাজেই বাংলা আমাদের দেশে শিক্ষার মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও সম্প্রতি ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত হলেও মাতৃভাষায় শিক্ষার কোন বড় রকম সুযোগ বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের নেই। এখনো প্রত্যেকটি বিষয়ে মৌল গ্রন্থাদি তাদেরকে অন্য ভাষায় পাঠ করতে হয়। ইংরেজী ভাষাতেই এখানে এটা হয়ে থাকে।

এদিক দিয়ে ছাত্রদের এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা রীতিমত শোচনীয়। কারণ বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার পর নীচের ক্লাসগুলিতে ইংরেজী পড়া উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং উচ্চতর পর্যায়েও ইংরেজী ভাষার চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়নি। এ কারণে ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ ভাবে ইংরেজীতে খুব দুর্বল এবং এই দুর্বল ভাষাজ্ঞান নিয়ে ইংরেজী ভাষায় রচিত বইপত্র পড়েও তারা সেই পাঠ থেকে উপযুক্তভাবে উপকৃত হতে পারে না। অনেক কিছুই তাদের কাছে দুর্বোধ্য থেকে যায়।

এই পরিস্থিতিতে বাঙালী জাতি, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি নিয়ে আমাদের দেশের শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন অংশ অনেক আদিখ্যেতা করলেও যাদেরই সামর্থ আছে তারা নিজেদের সন্তানদের ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে ভর্ত্তি করে। এর সহজ কারণ বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা করালে তাদের শিক্ষা ঠিকমত হয় না এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জীবনের নানা কাজে তারা ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে পড়া ছাত্রছাত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার সাথে সাথে সরকারের, করণীয় ছিল একটি অনুবাদ সংস্থা গঠন করে বিভিন্ন বিদেশী ভাষা থেকে প্রত্যেক বিষয়ের মৌল এবং সহায়ক গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া ভর্তুকীর মাধ্যমে এক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগকেও সাহায্য করা। কিন্তু এ দেশের শাসক শ্রেণীর অতি নিম্ন সাংস্কৃতিক মান এবং বিভিন্ন প্রকার ধান্দাবাজীর কারণে এ দিকে নজর দেবার কোন প্রয়োজন তারা বোধ করে নি।

এই পরিস্থিতি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মান ভীষণভাবে নীচে নামিয়ে এনে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাই ভেঙ্গে ফেলার মত অবস্থা সৃষ্টি করেছে। যে ভাষা শিক্ষার মাধ্যম যে ভাষায় বই নেই, যে ভাষায় বই আছে সেই ভাষার কোন দক্ষতা ছাত্রদের নেই। এই পরিস্থিতি যে শিক্ষা ব্যবস্থার ভাঙনকে এক চরম বিপজ্জনক জায়গায় এনে দাঁড় করাবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই এবং সেটাই এখন বাংলাদেশে হয়েছে।

এটাই এক ক্ষেত্র যেখানে বিদেশে বসবাসরত শিক্ষিত বাঙালীরা দেশের জনগণের জন্য একটা ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। প্রত্যেক দেশেই বাঙালীদের নিজেদের সংস্থা আছে। এগুলির মাধ্যমে, এমনকি ব্যক্তিগতভাবে, প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বই ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, মার্কিন, রুশ, স্প্যানিশ, আরবী, ফারসী, চীনা, জাপানী ইত্যাদি ভাষা থেকে বাংলাতে অনুবাদের ব্যাপারে তাঁরা উদ্যোগ নিতে পারেন।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও

পাঠ্যবইয়ের তালিকার খবর নিয়ে তাঁরা প্রয়োজনীয় বইপত্র চিহ্নিত করে অনুবাদের ব্যবস্থা করতে পারেন। যে যে ভাষা জানেন, সেই ভাষাতে বই বাছাই করে তাঁরা নিজেরা এবং অন্য পরিচিতদেরকে দিয়ে এ অনুবাদ আজ করতে পারেন। শুধু তাই নয়, এভাবে অনুদিত বই প্রকাশনার ব্যাপারেও তাঁরা উদ্যোগ নিতে পারেন। এর জন্য তহবিল গঠন করতে পারেন যাতে বাংলাদেশের দায়িত্বশীল প্রকাশনী সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনে ভর্তুকী দিয়ে হলেও এ ধরনের অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করা যায়। এই তহবিল গঠনের জন্য তাঁর শুধু উচ্চ শিক্ষিত ও বিদেশী ভাষা জ্ঞান সম্পন্ন লোকদের মাধ্যমে নয়, বিপুল সংখ্যক স্বল্প শিক্ষিত ও শারীরিক শ্রমে নিযুক্ত বিদেশে বসবাসরত বাঙালীদের কাছেও তহবিলের জন্য আবেদন করতে পারেন। এ কাজ তাঁরা পরিকল্পিতভাবে করার জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ নেবেন সেটা বাইরের কারও পক্ষে বলা বা নির্ধারণ করে দেওয়া সম্ভব নয়। এটা তাঁদের নিজেদেরকেই করতে হবে। তবে একথা খুবই সঠিক যে, এ ক্ষেত্রে বিদেশে বসবাসরত বাঙালীরা বাংলাদেশের জনগণের জন্য কিছু করার দায়িত্ববোধ করলে এই কাজ করার মাধ্যমেই তাঁরা নিজেদের সে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। এক হিসেবে বলা চলে, এটাই হলো এ মুহূর্তে প্রবাসী বাঙালীদের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দেশপ্রেমমূলক কাজ।

ঢাকা

৬-৭-২০০১।

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

জানিয়েছেন সাংবাদিকেরাও। অথচ এই শেখ হাসিনা পাঁচ বছর আগে কতই না নিকটজন ছিলেন সাংবাদিকদের, তারা একসাথে বিভিন্ন জেলায় গেছেন নির্বাচনী জনসভা কভার করতে। শেখ হাসিনা তখন বড় আপনজনের মতোই সাংবাদিকদের ভালোমন্দের খোঁজখবর নিয়েছেন, পথকষ্ট একই রকমভাবে ভোগ করেছেন। নির্বাচিত হওয়ার পরে তিনি বলেছেন, রাস্তা বন্ধ করে তিনি চলাচল করবেন না। মধ্যে কেটে গেছে মাত্র পাঁচ বছর। এরই মধ্যে যেন ঘটে গেছে আকাশ-পাতাল পরিবর্তন। এখন শেখ হাসিনা কেবল রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করতে চান, তা নয়, তিনি নির্বাচনী জনসভায়ও মানুষের কাছাকাছি হতে পারবেন না।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের প্রাক্কালে মমতা ব্যানার্জিকে সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রটোকল দেওয়া হয়েছিল। মমতা ব্যানার্জি তার বক্তৃতায় সাধারণ সমালোচনা করেছেন এই নিরাপত্তার, বলেছেন, তিনি যাতে জনগণের কাতারে যেতে না পারেন, এ জন্যে এটা হল বামফ্রন্টের ষড়যন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলেছে, না, এটা কোনো ষড়যন্ত্র নয়, এটা হল একজন নেত্রীকে বিপদ-মুক্ত রাখার প্রয়াস। ওখানে নেত্রী নিরাপত্তা বাহিনী চান না, সরকার তাকে জোর করে দেয়, আর এখানে নেত্রী নিজেই নিরাপত্তা বাহিনীর বেড়াজালে আবদ্ধ থাকতে চান।

এই বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে আমাদের মন বিষণ্ন হয়ে যায়, আমরা কী ভেবেছিলাম, আর রাজনীতি আমাদের কোথায় নিচ্ছে? ক্ষমতা মানুষকে এতটা জনবিচ্ছিন্ন করে!

আমাদের মনের ওপরের এ মেঘ সরাতে যে কত বর্ষার বৃষ্টি লাগবে!! ❑

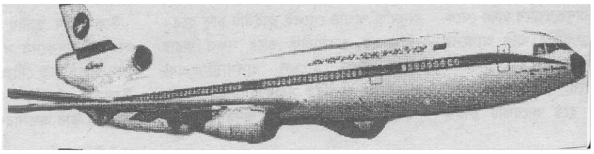

ক্যানাডায় বসবাসরত

বাঙালীদের জন্য সুখবর!!

ক্যানাডা এবং আমেরিকার যে কোন শহর থেকে ইউরোপের লন্ডন, প্যারিস, ফ্র্যাংকফোর্ট কিংবা রোম হয়ে বাংলাদেশ বিমানে ঢাকা, কোলকাতা ও সিলেটের টিকিট আমরা ইস্যু করে থাকি। নিউইয়র্ক থেকে ঢাকা বা সিলেটের মতন ভাড়ায় আপনি মন্ট্রিয়ল কিংবা টরন্টো থেকে ঢাকা অথবা সিলেট ভ্রমণ করতে পারেন।

Biman
BANGLADESH AIRLINES
Your home in the sky

এখন ক্যানাডাসহ উত্তর আমেরিকার যে কোন শহর থেকে লন্ডন হয়ে সরাসরি সিলেট যাতায়তের ব্যবস্থা আমরা করে থাকি

জাতীয় এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করে দেশ ও জাতির কল্যাণ করুন।

(বিমান অনুমোদিত এজেন্ট)

S.I. TRAVELS

(T.D. BANK BUILDING)
1410 GUY STREET, SUITE 19
MONTREAL, QUEBEC, CANADA, H3H 2L7
Tel : 514-931-4070
Fax : 514-931-1200

TOLL FREE FROM ANY CITY IN CANADA & USA : 1-877-936-1100

চতুর্থ মাত্রা

মিশন ইমপসিবল!

জাকারিয়া স্বপন

সিলিকনভ্যালীর অফিসের সময়সীমা ঠিক নিউইয়র্ক বা অন্য কোনও কর্পোরেট অফিসগুলোর মতো নয়। কাঁটায় কাঁটায় সকাল আটটার মধ্যেই অফিসে পৌঁছুতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আপনার মতো পৌঁছুলেই চলে। এই স্বাধীনতাটুকু আছে। পাশাপাশি আবার দায়িত্বও আছে। যে কাজটি দেয়া হয়েছে সেটা সময়মতো শেষ করতে হবে।

আমি রাত জাগি বলে বরাবরই দেরি করে ঘুম থেকে উঠি আর দেরি করে অফিসে যাই। কাউছারের কাজ হলো ফোন করে ভোরের ঘুমটি ভাঙ্গানো। জার্মানীর সাথে সময়ের একটা বিশাল ব্যবধান থাকায় এই কাজটি সে করে থাকে। আমার যখন সকাল, ওর তখন বিকেল। তাই আমাকে ধরার একমাত্র উপায় হলো, অফিসে যাবার আগ মুহূর্ত। এটা ও বুঝে ফেলেছে। যদিও সাধারণতঃ আমি ওই সময়টাতে ফোন ধরি না। তারপরেও কলার আই.ডি-তে মনে হলো আমেরিকার বাইরের কল। ইদানিং অবশ্য বুঝেই ফেলেছি, কাক ডাকা ভোরে (এখানে সকালে কাক ডাকে) ফোন আসা মানেই হলো, জার্মানীর ফোন, নয়তো ঢাকার।

ঘুম জড়ানো চোখে বললাম, হ্যালো।

সেটা কাউছারের কানে গেলো বলে মনে হলো না। তাকে বেশ উত্তেজিতই মনে হলো। আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বলতে থাকলো, জার্মানীর বিখ্যাত খবরের কাগজ ফাইনানশিয়াল টাইমস-এ পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে বাংলাদেশের উপর নিউজ বের হয়েছে।

আমি কোনও কিছু চিন্তা না করেই বললাম, ঠিক আছে ই-মেইল করে দাও। নইলে ওয়েব সাইটের ঠিকানা দাও, ইন্টারনেটে পড়ে নেব।

পত্রিকাটি মূলতঃ ইংল্যান্ডের। তবে জার্মানীতে স্থানীয় ভাষায় নিজস্ব সংস্করণ বের হয়। তাই সেটা ই-মেইল করা গেলো না, ইন্টারনেটেও পড়া যাবে না। তাকে বললাম, অনুবাদ করে পাঠাতে। সে তাই করলো।

এবছর ২২-২৮শে মার্চ জার্মানীর হ্যানোভার শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে সিবিট (CeBIT) তথ্যপ্রযুক্তি মেলা। বাংলাদেশ সেই মেলায় অংশ নিয়েছিল। তারই উপর বিশাল প্রতিবেদন ছেপেছে ফাইনানশিয়াল টাইমস যার শিরোনাম দিয়েছে “মিশন ইমপসিবল”।

উক্ত প্রতিবেদকের মতে, তথ্যপ্রযুক্তি বাজারে বাংলাদেশের সম্ভাবনা নাই বললেই চলে। তার প্রধান কারণ হিসেবে প্রতিবেদক মজার কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন।

জার্মানীর প্রতিবেদক বলেছেন যে, তিনি দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছেন বাংলাদেশের ষ্টলে কেউ কোনও তথ্যের জন্য গেলে ষ্টলের লোকজন তাদেরকে এড়িয়ে যাচ্ছে এবং কথা বলতে সংকোচবোধ করছে। প্রতিবেদক উৎসাহী হয়ে বাংলাদেশী ষ্টলে জিজ্ঞেস করতে গেলে, একজন পকেট থেকে চিরুনী বের করে মাথার চুল আচরাতে শুরু করে দেন। লেখক এটাকে রীতিমতো অভদ্রতা ও অশিক্ষিত আচরণ বলে উলে-খ করেছেন। বাংলাদেশী ভদ্রলোক লেখককে জানান যে, তারা তাদের ষ্টলে কোনও অতিথি আশা করছেন না।

লেখক দমবার পাত্র নন। তিনি বাংলাদেশী ষ্টলের সেই ভদ্রলোকের সাথে আলাপ করার চেষ্টা করেন। বহু কষ্ট করে ভাঙ্গা ইংরেজীতে যে তথ্যটুকু তিনি বের করতে সমর্থ হন, তার সারমর্ম হলো এরকম। রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর উদ্যোগে ও খরচে বাংলাদেশ থেকে কিছু সফটওয়্যার কোম্পানী জার্মানীতে গিয়েছে। কোম্পানীগুলো নিজেদের পয়সায় কেবলমাত্র বিমানের টিকিটটি কিনেছে। বাদবাকি খরচ হলো ব্যুরোর। ব্যুরো এই বাবদ ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে।

পুরো বিষয়টিই একজন বিদেশী সাংবাদিকের চোখ থেকে দেখা। তিনি কিছু কিছু ব্যাপারে ভুলও করতে পারেন। যারা এই মেলায় অংশ নিয়েছিলেন, তারা আরো ভালো বলতে পারবেন, আসলে ওই মেলায় বাংলাদেশ জনগণের টাকা খরচ করে কী করেছিল, কী তারা অর্জন করেছেন! বাংলাদেশ অবশ্য ইদানিং বেশ কিছু আন্তর্জাতিক মেলায় অংশ নিয়েছে। টেকবাংলা, সিলিকন বাংলা ইত্যাদি নামে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। কেউ কেউ এধরনের ট্রিপে এসে লাসভেগাসে জুয়া খেলতেও ব্যস্ত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। সেই সব মেলা থেকে আমরা কী পেলাম, তারও কোনও লিখিত বক্তব্য কোথাও ছাপা হয়েছে বলে দেখিনি। বাংলাদেশে কোনও কিছুরই জবাবদিহিতা নেই। জনগণের যে সঠিক তথ্য জানার অধিকার আছে, এই বিষয়টি কেউ উপলব্ধি করেন বলে আমার মনে হয় না। আমরা যে জনগণের টাকা খরচ করছি, সেটাই বা উপলব্ধি করি ক'জন? তারপরেও যদি কোনও শিক্ষিত কর্মকর্তা থেকে থাকেন, তারা হয়তো এটার সত্যি তথ্যভিত্তিক একটি রিপোর্ট পত্রিকায় ছাপতে পারেন।

আর জার্মান সাংবাদিকের তথ্য যদি সত্যি হয় (সত্যি না হবার অবশ্য তেমন কোনও কারণ দেখি না), তাহলে বলতেই হবে, বকুলপুর অনেকদূর। ❑

কমপিউটার প্রকৌশলী
সিলিকনভ্যালী থেকে
৮ই জুন ২০০১
ই-মেইলঃ zs@e-Mela.com

টিপু সুলতানের প্রবাস জয়

আসিফ সালেহ্

বাংলাদেশে সন্ত্রাসীদের আক্রমণে নির্যাতিত ও আহত সাংবাদিক টিপু সুলতানের চিকিৎসার সাহায্যার্থে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিলেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে। আসিফ সালেহ ইন্টারনেট ভিত্তিক তার সেই উদ্যোগ ও কর্মকান্ডের কথা লিখেছিলেন দৈনিক 'প্রথম আলো'র ১৫ই মে সংখ্যায়। তারপর আরও বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়েছে। নির্ভীক সাংবাদিক টিপু সুলতানের চিকিৎসা চলছে বাংলাদেশের বাইরে। ধীরে ধীরে সেরে উঠছেন তিনি। 'পড়শী'র অনুরোধে আসিফ সালেহ 'প্রথম আলো'তে প্রকাশিত তার লেখাটি পরিবর্ধন করে পাঠিয়েছেন সর্বশেষ ঘটনাবলী সংযোজন করে।

ব্যাপারটা ঘটল হঠাৎ করেই। রোববারের অলস এব দুপুরে প্রতিদিনের অভ্যাস মতো প্রথম আলো পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণ খুলতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল শিরোনাম, "টিপুর জন্য কি আমরা কেউ এগিয়ে আসব না?" তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল ফেনীর টিপু সুলতানের কথা। দু'মাস আগে ওর ওপর হওয়া নির্যাতনের খবর পড়ে মন খারাপ হয়েছিল ভীষণ। কিন্তু আর দশজন প্রবাসীর মতো সেটা বড় জোর একদিনের মন খারাপ হওয়াতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। মতিউর রহমানের লেখাটি যেন ধাক্কা দিয়ে জেগে ওঠাল আমাকে। যে ছেলেটা এতটা সাহস করে দোর্দন্ড প্রতাপশালী জয়নাল হাজারীর বিরুদ্ধে লিখেছিল, যাকে শ্রেষ্ঠ সংবাদদাতার পুরস্কার দিয়ে আমরা পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলাম, ওর এই দু:সময়ে আমরা এত চুপ কেন?

কে এই টিপু সুলতান? বাংলাদেশের সংবাদ সংস্থা ইউ.এন.বি-র শ্রেষ্ঠ সংবাদদাতার পুরস্কার পাওয়া সাংবাদিক টিপু। ফেনী থেকে নিয়মিত সে সাহসী সব রিপোর্ট পাঠিয়ে গেছে গত কয়েক বছর বিভিন্ন হুমকি উপেক্ষা করে। ফেনীর সর্বময় কর্তা, সংসদ সদস্য জয়নাল হাজারী এবং তার পাঁচশ সদস্যের সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে লিখতেও সে কুণ্ঠা বোধ করেনি। ফেনীর গডফাদার বলে পরিচিত এই হাজারী ফেনীতে ততদিনে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। এই বছর জানুয়ারীর পনেরো তারিখে ফেনীর একটি বালিকা বিদ্যালয় তাদের পুরস্কার বিতরণী সভায় তাকে প্রধান অতিথি না করার দু:সাহস দেখিয়েছিল। 'শাস্তি'স্বরূপ তার সন্ত্রাসী বাহিনী সম্পূর্ণ স্কুলটি গুঁড়িয়ে দেয় মাটিতে। ফেনীর এই ঘটনার রিপোর্ট পাঠিয়ে টিপু তার সর্বনাশ ডেকে আনে। রিপোর্টটি প্রধান প্রধান বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত হওয়ার তিনদিনের মধ্যে জানুয়ারী ২৫-এ টিপুকে পাঁচ-ছয়জন মুখোশধারী ধরে নিয়ে যায় এবং তাকে হকি স্টিক দিয়ে পিটিয়ে এবং কুপিয়ে তার দুই হাঁটু এবং দুই হাত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হয়। মৃত মনে করে তাকে এরপর একটি রিকশার পাশে ফেলে চলে যায় ওরা। এরপরের কাহিনী আরো দু:খজনক। হাসপাতালে এসেও তার রক্ষা হয়নি। সেই মাস্তানদের হুমকির মুখে ডাক্তাররা তার চিকিৎসা করেনি - ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। টিপুর ভাই এরপর চিহ্নিত সেই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলে পুলিশ তার মামলা নেয়নি। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টে মামলার পর কোর্টের নির্দেশে পুলিশ মামলা নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তদন্ত এগিয়েছে ঐ পর্যন্তই। এরপর টিপুর বাবা-মাকে ঘর ছাড়া করেছে হাজারীর দল। আর ধীরে ধীরে টিপু এগিয়ে গেছে নিশ্চিত পঙ্গুত্বের দিকে।

প্রবাস থেকে আমার এই ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে সরব হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। সেই সঙ্গে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ার এবং প্রথম আলো ফান্ডের জন্য প্রবাসীদের কাছ অর্থ সংগ্রহের আবেদন করব বলে ঠিক করলাম। অল্প সময়ে দ্রুত খবর ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে যে মাধ্যমটির জুড়ি নেই, সেই ইন্টারনেটেরই শরণাপন্ন হলাম। 'একজন সাহসী সাংবাদিককে সুস্থ করতে সহায়তা করুন' শিরোনামে যে ওয়েব সাইটটি তৈরি করলাম, তা ছিল খুব সাধারণ কিন্তু এতে টিপুর নিগৃহীত হওয়ার ইতিহাস থেকে শুরু করে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী সংবাদপত্রের ক্লিপ সবই জুড়ে দিয়েছিলাম। তথ্যকেন্দ্রিক এই ওয়েব সাইটটিকে আরো মানবিক করার জন্য সাহায্য নিলাম কানাডাবাসী সাহিত্যিক আলম খোরশেদের। অনুরোধ পাওয়ার দুই ঘন্টার মধ্যেই অসাধারণ একটি লেখা ওয়েব সাইটটিতে দেওয়ার জন্য আমায় পাঠালেন তিনি। অত:পর টিপু সুলতানের নতুন স্থায়ী আবাস তৈরি হলো ইন্টারনেটে।

কিন্তু সমস্যা হলো ব্যক্তি আমাকে টাকা দেবে কে বিশ্বাস করে। সংগঠনের অভাবে আমি ওয়েব সাইটের প্রচার শুরু করতে পারছি না। এরমধ্যে যোগাযোগ হয়ে গেল কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টের এশিয়া বিষয়ক সম্পাদক কবিতা মেননের সঙ্গে। কবিতা আগ্রহ দেখালেন টিপু সুলতানের ব্যাপারে। টিপুর নির্যাতনের ব্যাপারে অবগত থাকলেও ঢাকা থেকে পাওয়া সংবাদের ওপর ভিত্তি করে তার ধারণা ছিল টিপুর সংবাদ সংস্থা ইউএনবি তার সমস্ত চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করছে। অবিলম্বে টিপুর জন্য কবিতা কিছু ফান্ডের জন্য আবেদন করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। কবিতার সঙ্গে কথোপকথন আমার কাজে এনেছিল এক দারুণ রকম প্রাণশক্তি। মনে হলো টিপুর জন্য অবশেষে কিছু একটা করতে যাচ্ছি।

পূর্ণোদ্যমে যোগাযোগ করলাম 'স্পন্দন' এবং বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন (বাফি) নামক দুটি অরাজনৈতিক নিরপেক্ষ এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ই-মেইল মারফত। মাত্র আধ ঘন্টার মধ্যে ফোন বেজে উঠল অফিসে। অন্য প্রান্তে বদরুল হোসেইন, বাফির সভাপতি। টিপুর ব্যাপারটির সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন এর আগে থেকেই। আমার উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি বললেন, 'লেটস ডু ইট।' দ্বিগুণ উৎসাহে

আমি অত:পর ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওয়েব সাইটটির প্রচারের কাজে। এরপরের দুই সপ্তাহের কাহিনী ইন্টারনেটে বাংলাদেশের অসংখ্য ওয়েব সাইটের এক বিরল সহযোগিতার কাহিনী; টিপু সুলতানের সঙ্গে অগণিত প্রবাসীর একাত্মতার কাহিনী এবং সমগ্র পৃথিবীতে ফেনীর টিপু সুলতানের সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ার কাহিনী।

বাফির কাছ থেকে সাড়া পাওয়ার পর এবার আমার কাজ হলো ওয়েব সাইটের প্রচার করা। এর জন্য বাংলাদেশীদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু ওয়েব সাইটকে চিহ্নিত করলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম এদের মাধ্যমে প্রচার চালাব। আমার স্ত্রী ঈশিতা পেশায় একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার। সেজন্য বিজ্ঞাপন তৈরিতে খুব অল্প সময়ই খরচ হলো। ইতিমধ্যে 'প্রথম আলো' পত্রিকার ইন্টারনেট সাইটে প্রথম পাতায় বিশাল করে আমাদের ওয়েব সাইটের উলে-খ করলেন পত্রিকার ওয়েব মাস্টার শাহাদাত হোসেইন। তহবিল সংগ্রহের মোড় ঘুরল তখনই। ওয়েব সাইটে দর্শকের ভিড় বেড়ে গেল নাটকীয়ভাবে।

২৪ ঘন্টার মাথায় এমনিভাবে একে একে ডেইলি স্টার, ভারচুয়াল বাংলাদেশ, ই-মেলা, এনএফবি, অনন্ত বার্তা প্রভৃতি জনপ্রিয় সাইটগুলোতে টিপু সুলতানের ছবিসহ একটি ব্যানার বিজ্ঞাপন শোভা পেতে লাগল। বলাবাহুল্য, এসব বিজ্ঞাপনই বিনামূল্যে দিতে রাজী হলেন প্রত্যেক ব্যবস্থাপক। দর্শক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল টিপু তহবিলে দানের অঙ্গীকার। অস্বীকার করব না প্রথম দিনে দর্শক সংখ্যার তুলনায় দানের পরিমাণ দেখে একটু হতাশ হয়েছিলাম। কিন্তু এরই মাঝে এল নববর্ষের রক্তস্নাত সকাল। ব্যাপারটা কাকতালীয় কিনা জানি না, তবে এই ঘটনার পরপরই অঙ্গীকারের পরিমাণ দ্রুত বাড়তে শুরু করল। রমনার ঘটনায় ক্রুদ্ধ প্রবাসীরা যেন প্রতিবাদ জ্ঞাপনের একটা মাধ্যম খুঁজছিলেন। টিপু সুলতানকে আবার সুস্থ করে তোলার মাধ্যমে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর সংকল্প ব্যক্ত করলেন তারা।

ওয়েব সাইটের একটি পাতায় দর্শকদের প্রতিবাদের কথা প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল। খুব দ্রুত ভরে উঠতে লাগল সে পাতাগুলো। জাপান থেকে শুরু করে সুইজারল্যান্ড, উত্তর কোরিয়া, ইরান থেকে বাংলাদেশীরা একে একে জানালেন তাদের ক্ষোভ। বাংলাদেশ থেকে ফারজানা লিখলেন, যত দিন টিপুর মতো মানুষ আছে, আর আছে তাকে সাহায্য করার মতো মানুষ, ততদিন আমাদের আশা আছে দেশকে সঠিক পথে ফেরানোর।

এরই মধ্যে আমার ওয়েব সাইটে স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার আবেদনে সাড়া এলো। কানাডা, লন্ডন, সুইজারল্যান্ড, জাপান ও ফিলিপিন্সে স্বেচ্ছাসেবক দল তাদের নিজেদের এলাকায় তহবিল সংগ্রহে নেমে পড়লেন। ফিলিপিন্সের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ল খান আরিফুল হকের আঁকা টিপুর জন্য তৈরি পোস্টার। সেই পোস্টারকে ভিত্তি করে টিপুর জন্য অনুদান সংগ্রহ করলেন ফিলিপিন্সের বাংলাদেশী ছাত্ররা। জাপানের টিপুও একইভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশী ছাত্রদের সাহায্য নিলেন। সুইজারল্যান্ডের দম্পতি সজল ও জুলিয়েট অভিবাসী বাঙালীদের কাছে চাঁদা তোলা শেষ করে ফোন করা শুরু করলেন তাদের আন্তর্জাতিক সহকর্মী ও আত্মীয়দের কাছে। ফলস্বরূপ দানের অঙ্গীকার এলো উত্তর কোরিয়া, ইরান, ইরাকের মতো দূরদূরান্ত থেকে। সপ্তাহের শেষ নাগাদ যখন আমার হাতে প্রথম চেকটি এলো, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট তহবিল সংগ্রহের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন নিউজ গ্রুপে পাঠানো আমার প্রেস রিলিজটি যখন চেইন মেইলের আকারে আমার কাছেই ফেরত এলো, তখন বুঝলাম বাঙালীরা খবরটি ই-মেইল মারফত পাওয়ার পর তাদের বন্ধুবান্ধব আর স্বজনদের কাছে আবার ফরোয়ার্ড করেছে।

প্রতিদিন চেক পাওয়ার পর ওয়েব সাইটটি আপডেইট করেছি তহবিলের নতুন হিসাব দিয়ে। দর্শকের সংখ্যা চললো বেড়ে, প্রতিদিন একটি-দুটি থেকে আট-নয়টি করে চেক পেতে শুরু করলাম। বড় বড় চেকগুলোর চেয়ে খুশি লাগতো ছোট ছোট চেকগুলো পেয়ে, যখন দেখতাম দরিদ্র ছাত্ররা বা ট্যাক্সিচালকরা তাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতা দিয়েও এই প্রতিবাদে শরীক হয়েছেন।

যারা আর্থিকভাবে সহায়তা দিতে পারেননি, তাদের মধ্যে অনেকে একটি ভিন্ন পাতায় টিপুর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, যা প্রথম আলোর বদৌলতে চলে গেছে টিপুর হাতে। সহায়তা এসেছে অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকেও। নিউইয়র্কের এক মার্কিন কর্পোরেট এটর্নীর কাছ থেকে একদিন ই-মেইল পেলাম টিপুর জন্য একটি ফান্ড রেইজিং ডিনার আয়োজনের ব্যাপারে। ইন্টারনেটে টিপুর কাহিনী পড়ে তিনি এতটাই আহত হয়েছিলেন যে তাকে সাহায্য করা নিজের কর্তব্য মনে করেছেন। সহায়তা পাওয়া গেছে প্রবাসী বাংলাদেশী চিকিৎসকদের কাছ থেকেও। হাতে সময়ের তাড়া না থাকলে হয়তো ওকে মার্কিনী মুলুকেই নিয়ে আসা যেত তাদের সাহায্যে। এছাড়া নিয়মিত ওয়েব সাইটের পরিবর্তন হয়েছে দর্শকদের মূল্যবান মতামতের ওপর ভিত্তি করে। ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা ও ফান্ডের নিয়মিত আপডেট এসেছে বিভিন্ন জনের পরামর্শের প্রেক্ষিতে। এমনি একটি পরামর্শ ছিল ওয়েব সাইটে এমন কারো লেখা দেওয়া যার লেখা পড়ে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা এই সাইটে দান করতে অস্বস্তি বোধ করবেন না। যেমনি বলা তেমনি কাজ। এ রকম ক্ষেত্রে আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর কথাই মনে আসে একবাক্যে। অত:পর লন্ডনপ্রবাসী আবুল কালাম আজাম ও শামীম আজাদের দ্রুত কর্মতৎপরতায় একদিনের মধ্যে আমার কাছে এল আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর চমৎকার একটি লেখা, যা তৎক্ষণাৎ চলে এলো ওয়েব সাইটে।

এ রকম অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের তহবিল সংগ্রহ লাভ করে গতি এবং দু' সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার ডলার প্রতিশ্রুতি পেলাম আমরা শুধু ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এসেছে পাঁচ পাউন্ডের চেক, এসেছে ৩০০ ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একজনের ১ হাজার ডলারের চেক। সর্বশ্রেণীর প্রবাসীর এমন অভূতপূর্ব সাড়ায় আমি যখন অভিভূত তখন এলো 'কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টস'-এর সেই কবিতা মেননের ফোন। টিপুর জন্য ৫ হাজার ডলারের একটি ফান্ড অনুমোদন পেয়েছে আবেদনের ভিত্তিতে। আনন্দে আমার চোখ বুজে এলো।

এরপরের ঘটনা ঘটেছে দ্রুত। মাত্র এক মাসের মধ্যে দেশে ও বিদেশে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় হয়ে যাওয়ার পর ৮ই মে টিপু ব্যাংককে যায়। সেখানে তার এ পর্যন্ত পাঁচটি অস্ত্রোপচার হয়েছে এবং ডাক্তাররা আশা করছেন আরো দুই মাস ফিজিওথেরাপীর পরে টিপু তার বাঁ হাতে ১০০% এবং ডান হাতে ৮০% শক্তি ফিরে পাবে এবং আবার ধরতে পারবে সেই তীক্ষ্ণ কলম। এদিকে টিপুর জন্য তৈরী ওয়েব সাইট (http://savetipu.tripod.com) এ এখনো দর্শনার্থীরা নিয়মিত তাকে শুভকামনা জানিয়ে যাচ্ছেন। ❐

লেখক বর্তমানে ওয়ালস্ট্রীটে একটি ব্যাংকে কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে কর্মরত।

পরিচিন্তন

বিচলিত এ প্রজন্মের চাই উপযুক্ত বাংলাদেশী আদর্শ পুরুষ

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় বাংলাদেশী বাঙালী ব্যক্তিত্বের আজ বড়ই অভাব। রবীন্দ্রনাথ প্রায় সত্তর বৎসর আগে নোবেল পুরস্কারের বিজয় মুকুট মাথায় পড়লে পরের বেশ কয়েক দশক ধরে বাঙালী - যারা কাব্য সাধনা করতো তাদের স্বপ্নের পুরুষ ছিল রবিঠাকুর। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত বাঙালীদের যে দল 'জ্ঞান গরিমা শিখবো বলে, কেউবা যাব জার্মানী'- স্পিরিটে উদ্বুদ্ধ ছিল তাদের প্রাণপুরুষ বোধহয় ছিল, স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু, সত্যেন বোস বা ডঃ কুদরত-ই-খুদার মত মহাপুরুষরা। আগের দিনে যারা সাধারণ মানুষের কাছাকাছি থেকে দেশ সেবা অর্থাৎ রাজনীতিতে দীক্ষিত হতো তারা এক নিঃশ্বাসে বেশ কয়েকজন 'রোল মডেলে'র নাম মুখস্ত বলতে পারতো; যেমন শেরে বাংলা, মাওলানা ভাসানী ও বংগবন্ধু শেখ মুজিব। পাকিস্তানের পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাঙালী যে প্রজন্ম জীবনের মায়াকে তুচ্ছ করে সংগ্রামের নেশায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তাদের কাছে আদর্শ পুরুষ ছিল স্বদেশী আন্দোলনের অমর বীরপুরুষরা যেমন তিতুমীর, সূর্যসেন ও ক্ষুদিরাম।

এখন সময় বদলেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। পরাধীনতার শেকল আমাদের পায়ে নেই, এখন আমরা ঝুমুর পায়ে বিজয় দিবসে মনভরে মুক্তির গান গাইতে পারি। কিন্তু হায়, যারা জীবন দিয়ে আমাদেরকে মুক্ত করে গেল, আমরা আমাদের মূল্যবোধের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে তাদের ত্যাগকে কী অন্যায় ভাবেই না উপহাস করছি। স্বাধীন দেশের বাঙালীদের কাছে, আমি নিজে যাদের অন্তর্ভুক্ত, ত্যাগ, সাধনা, অর্জন, দান এবং প্রতিদানের সংজ্ঞা বদলে গেছে। ত্যাগের অর্থ হয়েছে কারও মূল্যবোধ ত্যাগ, সাধনা দাড়িয়েছে কিভাবে বিনা শ্রমে শুধু অসৎ উপায়ে উপরে উঠা যায়, সেটার সাধনা, অর্জন দাড়িয়েছে পয়সা দিয়ে ডিগ্রী অর্জন, দান করছি যেন লোকে ভোট দেয় আর প্রতিদান দিচ্ছি নিজের পদ হারাবো এই ভয়ে।

মূল্যবোধের দেউলিয়াত্বের কারণে আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষ আর কোন মননশীল বা সৃষ্টিশীল কাজে সময় ব্যয় করতে চায় না। যার ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা আমাদের মাঝ থেকে আর কাকেও মনীষী হতে দেখছি না। দেশের রাজনীতি ও যেমন চলছে 'গারবেজ ইন গারবেজ আউট' অর্থাৎ 'অগারা যাচ্ছে আরও জগাখিচুড়ী হয়ে বেরুচ্ছে' এই প্রথায় তেমনি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গুলোও সাধক হওয়ার জন্য আর অনুকুল পবিবেশ নিয়ে বেঁচে নেই। তাই ছোট বেলার আমাদের খেলার কোন সাথী জানার অফুরন্ত নেশায়, অজেয়কে জয় করার অদম্য অধ্যবসায়কে সঙ্গী করে যে একদিন জগৎবিখ্যাত কোন মনীষী বা বিজ্ঞানী হয়ে যাবে সেটা আমরা ভাবতেও পারি না। সত্যিকারের মানুষ তৈরী করার জন্য উপযুক্ত সেই পরিবার বা সমাজ যেটা সুস্থ ও সঠিক। আমাদের নানা বা দাদারা আমাদের মত তথ্য প্রযুক্তির প্রাচুর্যতায় বাস করতেন না; মার্কনী সাহেবের ওয়ান ব্যান্ড রেডিওতে সে সময় ওরা বিবিসিও শুনতে পেতেন না। ওনাদের 'আমেরিকা অন লাইন' ছিল তখন ডাকঘর বা বেশীর পক্ষে সংবাদপত্র আর 'ব্রড ব্যান্ড' ছিল দীন ডাক হরকরাদের মানবীয় গতি। তারা তাই দেশী বিদেশী বিখ্যাত মানুষদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেত অনেক দেরী করে। তবে ওদের সবারই আদর্শের মানুষ ছিল সে হয়তো হাতের কাছের কোন সৎজন, বিদ্যালয়ের নীতিবান কোন পণ্ডিত স্যার অথবা পাশের বাসার 'ঘুষ খায় না' এমন নীতিবান কোন সরকারী কর্মচারী।

বিগত দুই প্রজন্মের বাংলাদেশী বাঙালীরা 'বাংলাদেশের ডায়েরী' মুখস্ত করে যারা আই কিউ বাড়িয়েছি তাদের বিখ্যাত কোন বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর নাম জানতে চাইলে বোধ হয় ডঃ কুদরত-ই-খুদার নামই বলতেন; আমাদের দাদারাও বলে গ্যাছেন, বাবারাও বলে গ্যাছেন আর আমাদের প্রজন্ম অন্ততঃ কলেজ পর্যন্ত যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগই পাইনি, শিখেছি স্যারদের বাসার ড্রইং রুমের টিউশনি ক্লাশে, তারা তো কুদরত-ই-খুদার নামও জানার সুযোগ পাইনি।

তাহলে আমরা যারা গত তিন দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইউরোপের মত দেশে এসেছি, সুযোগ পেয়েছি মন উজার করে শেখার, ব্যয়বহুল গবেষণা করার, পৃথিবী বিখ্যাত শিক্ষক ও সহযোগী বিজ্ঞানীদের সান্নিধ্যে আসার তারা কি করছি? মিলিয়ন-বিলিয়ন ডলারের ল্যাবরেটরীজে বসে একালের উন্নত মানের প্রযুক্তিকে যারা অনবরত আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিশ্রম করছি তারা অন্য দেশের মানুষের কাছে বাদ দিলাম, দেশের ছেলেমেয়েদের কাছে অনুসরণীয় হতে পারছি না কেন? যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী প্রবাসীদের যারা এদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে জড়িয়ে আছে তাদের কেউ কি সৃষ্টিশীল অভিনব গবেষণা করছে না? অবশ্যই করছে। তবে তাদের সংখ্যা এখনও চোখে পড়ার মত নয়। এ প্রজন্মের মনে গাঁথার মত হতে হলে অথবা পৃথিবীর মানুষের কাছে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে হলে 'নোবেল পুরস্কার' বা 'অস্কার' প্রাপ্তির প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন নিজ নিজ ক্ষেত্রে, নিজ নিজ গবেষণায় মাত্রা ছাড়িয়ে সময় ও মন দেয়া আর কর্মটাকে ধর্ম হিসেবে নেয়া।

গত জুন মাসে ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারস্ সংক্ষেপে 'আই ই ই ই' এর ২০০১ সালের মেডেল অব অনার সম্মানটি পেলেন বিজ্ঞানী হারউইগ কোজেলনিক। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বিশ্ববিখ্যাত এই পেশাদার সংস্থাটি তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীদের অভাবনীয় ও অনন্য উৎকর্ষ ও বিস্ময়কর আবিষ্কারের

বিজ্ঞানধর্মী গল্পগুলো সতীর্থদের কাছে পৌছে দেয়। এই বৈজ্ঞানিকের জন্ম অস্ট্রিয়ায়। উনি আমেরিকার 'বেল ল্যাবরেটরী'জের একজন গবেষক। বৈজ্ঞানিক কোজেলনিক লেজার ও আলোক-ইলেকট্রনিক্সে তার চলি-শ বৎসরের গবেষণায় চমৎকার সব উদ্ভাবনার স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মানীত হলেন। আমরা যারা আমাদের কর্মক্ষেত্রে বসে এই সংবাদটি পড়লাম নিঃসন্দেহে পুরো অস্ট্রিয়ান জাতির উপর তৎক্ষনাৎ আমাদের একটা শ্রদ্ধাবোধ জন্মে গেল। কোজেলনিকের পারিবারিক পরিবেশে ডাক্তার হওয়ার অনুপ্রেরণা ছিল বেশী; ওর দাদা কাজিন এবং খোদ সহোদর সবাই ডাক্তার ছিল। তবে সে সময় অর্থাৎ ১৯৫০ সালের দিকে অস্ট্রিয়ায় ডাক্তারের সংখ্যা প্রয়োজনাতিরিক্ত হওয়ায় ওর বন্ধুরা ওকে ডাক্তারী পড়তে নিরুৎসাহিত করল এই বলে, 'ব্যাটা ডাক্তারী পড়িস না। এই দেশে ডাক্তারের যা ছড়াছড়ি এখন, দেখিস পাশ করে প্র্যাকটিস করার সুযোগ না পেয়ে সত্যি সত্যি একদিন পাড়ার মুদির দোকানে সিগারেট বিক্রী শুরু করবি'। নিজের কষ্টার্জিত বিদ্যা বুদ্ধির করুণ পরিণতি আগাম আঁচ করতে পেরে কোজেলনিক জীবনের লক্ষ্য পরির্তন করেছিল- সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শুরু করেছিল। এই মেডেলটি তার সাফল্যের একমাত্র স্বীকৃতি নয়, তার নিজস্ব খাতায় আরও জমা হয়েছে ৩৪ টি মূল্যবান 'পেটেন্ট'। পেটেন্ট হচ্ছে কোন আবিস্কারের স্বত্ব। যদি অন্য কোন কোম্পানী কোন বৈজ্ঞানিকের কোন আবিস্কার ব্যবহার করে সেই কোম্পানীকে আবিস্কারক বা তার প্রতিষ্ঠানকে রয়েলটি বা খাজনা দিতে হয়। এই স্বত্ব সতের বছর ধরে কার্যকর থাকে। নিজের জীবনের মূল্যায়ন করতে যেয়ে ঊনসত্তর বছরের এই সম্মানীত গবেষক বিড়বিড় করে বলেছেন, 'কি আশ্চর্য! বিগত বছর গুলোতে এত কিছুর মধ্যে জড়িয়ে ছিলাম, বিশ্বাসই হচ্ছে না'।

এই যে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কোজেলনিক ওনারও একজন আদর্শ পুরুষ আছে, সে হচ্ছে রেডিও এ্যাস্ট্রোনমির উদ্ভাবক কার্ল জেন্‌স্‌কি। আদর্শ পুরুষরা সবসময় অনুকরণীয় অনুসরণীয় হয়। যে জাতি এই সমস্ত প্রতিভাবান মহাপুরুষদের বেশী বেশী পায় সে জাতির নতুন প্রজন্মের কাছে উপরে উঠার পথটা তত বেশী পরিস্কার থাকে।

আমরা যারা দেশকে বঞ্চিত করে বাইরে চলে এসেছি তারা নিজেদের পেশায় ও গবেষণায় কৃতিত্ব দেখিয়ে দেশকে মূল্যবান উপহার দিতে পারি। সে উপহার হল দেশের নতুন প্রজন্মের জন্য তাদের 'রোল মডেল' হয়ে, তাদের সাধনা পুরুষ হয়ে। দেশ তার সন্তানদের মাঝ থেকে বিরতিহীনভাবে কোজেলনিক হতে দেখলেই নতুন প্রজন্ম সঠিক দিশে খুঁজে পাবে। আমাদের মনে রাখার মত স্বদেশী বিজ্ঞানী 'কুদরত-ই-খুদা'য় এসে থমকে যাবে না। জাতির জন্য নতুন আশার জন্ম হবে। আমাদের বর্তমান বিচলিত প্রজন্ম 'বুয়েট'এর মত বিদ্যাপীঠে এসে নষ্ট রাজনীতি করা ছেড়ে দেবে। ❒

সানফ্রান্সিসকো বে-এরিয়া

জুন ১৮,২০০১।

'পড়শী' তে লেখা পাঠাবার নিয়ম

উত্তর আমেরিকায় অপ্রকাশিত লেখা প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে

অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হবে না

লেখা ই-মেইল, ডাক অথবা ফ্যাক্সে পাঠাতে পারেন

যোগাযোগ :

editors@porshi.com

e-fax : 707-988-0328

(৮ পৃষ্ঠার পর)

কারণে তারা এখন পর্যন্ত তার প্রাণহরণে বিশেষ সুবিধা না করতে পারলেও ওঁৎ পেতে রয়েছে যেন আর মাসখানেক বাদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরপরই তারা মরণ আঘাত হানতে পারে। ঘাতকেরা যাতে সহজে সেই সুযোগ না পায় সেজন্য হাসিনার নিজের দল ও শুভানুধ্যায়ী মহল প্রধানমন্ত্রীত্বের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পরও যেন তার বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে তার দাবী তুলেছেন এবং তা বিধিবদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। ন্যূনতম মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সচেতন ও শান্তিকামী মানুষ মাত্রই এই উদ্যোগকে সমর্থন করবেন। কেননা এর দ্বারা একদিকে যেমন বাংলাদেশের স্থপতির প্রাণরক্ষার্থে আমাদের নিদারুণ ব্যর্থতার প্রায়শ্চিত্ত করে তার পরিবারের প্রতি একটি নৈতিক জাতীয় দায়িত্ব পালিত হয় অন্যদিকে দেশকে অস্থিতিশীল ও নৈরাজ্যপূর্ণ এক সম্ভাব্য পরিণতির দিকে ঠেলে দেবার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

তাহলে সরকার বিরোধী দলসমূহ এবং অন্যান্যরা এর বিরোধিতা করছেন কেন? তাদের প্রধান আপত্তি, অন্তত মুখে তারা যা বলছেন, তা হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও হাসিনা যদি গণভবনে অবস্থান করেন এবং একই রকম বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে নির্বাচনী প্রচারণা অভিযান চালান তাহলে নির্বাচন প্রভাবিত হবে এবং ফলস্বরূপ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চেতনা ভূলুণ্ঠিত হবে। নিঃসন্দেহে তাদের এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা রয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক প্রস্তাবিত আইনে এসবের আদৌ কোন বিধান রয়েছে কিনা সেটাইতো এখনও জানা যায় নি।

সংসদে বিল উত্থাপিত হবার পর যদি দেখা যায় তা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চেতনাবিরোধী এবং সংবিধান সম্মত নয় তাহলে অবশ্যই বিরোধী দলের তার বিরোধিতা করার, প্রয়োজনে তাকে প্রতিহত করার অধিকার রয়েছে। গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনায় বিশ্বাসী মানুষও তখন তাদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর সঙ্গে তো বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয়টিরও কোন সম্পর্ক নেই। তাহলে তার নিরাপত্তার বিরুদ্ধতার যৌক্তিকতা কী ? বিশেষ করে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র পক্ষে তো এর বিরোধিতা করা আদৌ শোভা পায় না। যেখানে খোদ তাদের দলনেত্রীই রাষ্ট্রের কাছ থেকে আজীবন নিরাপদ বাসভবন সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা পেয়েছেন? তাহলে কি বিরোধী দলীয় নেত্রী ও তার অনুসারীরা স্রেফ প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নিরাপত্তার বিরোধিতা করে তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে তার জীবনকে সংকটাপন্ন করে তুলতে চাইছেন আর সেই সুবাদে রক্ষা করতে চাইছেন তাঁর পিতার আত্মস্বীকৃত খুনীদের? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে বলবো আজ বাংলাদেশের সামনে ঘোর দুর্দিন। যে দেশের মানুষ হাজারো বিপর্যয়ের মধ্যেও তাদের সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য উদারতা, মমতা ও মানবিকতাকে বিসর্জন দেয় নি কখনো, তাদের একটি অংশ, যারমধ্যে সবচেয়ে উচ্চশিক্ষিত মহলের সদস্যের সংখ্যাও নিছক কম নয়, যখন তাদেরই একজন সহনাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা দিতে অস্বীকার করে তাকে সচেতনভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে কুণ্ঠিত না হয় তখন তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি আর রাজনীতির প্রতি ধিক্কার জানানো ছাড়া আর কী ই বা করতে পারি আমরা!! ❒

মন্ট্রিয়ল, কানাডা

৯ জুন, ২০০১ সাল।

প্রতিধ্বনি

সবার আগে বুবুর নিরাপত্তা

ফারুখ ফয়সল

লোকে বলে আমি আমার লেখায় শুধু বাংলাদেশের দুষ্ট প্রসংগ টেনে বাংলাদেশের চলমান ঘটনাবলীর খালিখালি সমালোচনা করি। তারা বলেন, খারাপ সবকিছুর পাশাপাশি বাংলাদেশেতো কিছু ভালো ঘটনা ঘটে। আমার পর্যালোচনায় অমন কোন ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে কিছু প্রশংসার কথা বলতে নাকি আমার আগ্রহের বড় অভাব বোধ হয়। সে সব সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে অবশেষে বাংলাদেশের বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের অন্ততঃ একটি ঘটনার প্রশংসা করবার সুযোগ আমার মিলেছে।

ঢাকা থেকে খবর পেলাম, মন্ত্রীসভা শেখ মুজিবের দুই মেয়ের, হাসিনা আর রেহানার, আজীবন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রদান সংক্রান্ত বিধানের চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ থেকে অমন ভালো খবর আর পাওয়া যায়নি। যুগোপযোগী, গণমুখী এমন সাহসী সিদ্ধান্ত নেবার জন্য মন্ত্রীসভাকে অন্ত রের অন্তস্থল থেকে অভিনন্দন।

আমাদের সকলের জানা যে, বাংলাদেশে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা আজ সবচেয়ে সংকটাপন্ন। আর সরকারের পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে সকল নাগরিকের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা। পাশাপাশি আমাদের বুঝতে হবে যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা আজ ১১কোটির বেশী। অত মানুষের নিরাপত্তা বিধান করা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু সমস্যা যতো বড় হোক, আওয়ামী লীগতো সেজন্য হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেনা ! বড় সমস্যার সমাধানের শুরু ছোট থেকে করতে হয়। সে জন্য হয়তোবা সরকার প্রথমে দু'জন বিশেষ নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে। দু'জন থেকে দশ জন, দশ জন থেকে দশ লাখ, দশ লাখ থেকে দশ কোটি মানুষের নিরাপত্তা দিনে দিনে যে আওয়ামী লীগ সরকার নিশ্চিত করতে পারবে, সে ব্যাপারে আমার ষোল আনা ভরসা আছে।

আমি আনন্দিত যে, সরকার বেশ পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমার বিশ্বাস শেখ হাসিনা ও রেহানার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পর পদে পদে নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আরো মানুষজনকে নিয়ে আসবার চিন্তা আওয়ামী লীগের "মাথায়" আছে। গ্রুপ ধরে ধরে সরকারকে আগাতে হবে।

শেখ কন্যাদ্বয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পর, সরকার বাংলাদেশের সকল পিতামাতা হারানো "অরফান" মেয়েদের নিরাপত্তা দিতে পারে। অমন মেয়েদের খুঁজে বের করায় যদি সমস্যা হয় তাহলে বিকল্প পথে শেখ মুজিবের সমস্ত আত্মীয়দের নিরাপত্তা দেয়া যেতে পারে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার বড় অংশ কাভার হয়ে যাবে ওভাবে।

আমরা জানি, বিরোধী দলের সমালোচনার জ্বালায় সরকার অনেক ভালো কাজ করতে পারেনা। শেখ মুজিবের আত্মীয়দের নিরাপত্তা দেয়া নিয়ে যদি তারা সমালোচনা করে তবে ভিন্ন রাস্তায় সরকার যেতে পারে। তারা তাহলে ভৌগোলিক ফরমুলার পথ নিতে পারে। যেমন, শেখ তনয়াদের নিরাপত্তার পর টুঙগীপাড়ার সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে সেকেন্ড স্টেজ। তারও যদি সমালোচনা হয়, তাহলে বলতে হবে, সরকার তৃণমূল পর্যায় থেকে ওপরের দিকে আসছে। টুঙগীপাড়ার পরে দেয়া হবে গোপাল গঞ্জের, তারপর ফরিদপুরের সকল সিটিজেনের নিরাপত্তা। অমনভাবে জেলার পর জেলার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে দিনে দিনে সারা বাংলাদেশ নিরাপদ হবে।

হাসিনা-রেহানার নিরাপত্তা বিধির একটি দুর্বলতা আমি খেয়াল করছি। তাদের নিরাপত্তার জন্য বিধিটি শুধু বাংলাদেশে কার্যকর হবে। কিন্তু শুধু বাংলাদেশে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাটা যথেষ্ঠ হবেনা। তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন আন্তর্জাতিক বিধানের। শেখ হাসেনার মেয়ে, জামাতা, ছেলে- সকলে আমেরিকা থাকে। সরকারী ও পারিবারিক কারণে হাসিনাকে মাঝে মধ্যে আমেরিকা আসতে হয়। শেখ রেহানার লন্ডনে বাড়ী আছে। মাঝে মাঝে তিনি বিলেতে থাকেন। বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ নিরাপত্তা বিধি কি করে বিলেতে, আমেরিকায় তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে?

দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিশ্বসভায় কোন আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা নেই। তা নাহলে সেখান থেকে সহজে আন্তর্জাতিক বিধানটি পাস করিয়ে আনা যেতো। তবে কফি আনানের সাথে শেখ হাসিনার চেনাজানা আছে। তাকে অনুরোধ করে জাতিসংঘের বিশেষ অধিবেশন ডেকে শেখ কন্যাদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে আন্তর্জাতিকীকরণ করা যেতে পারে।

যতোদিন আন্তর্জাতিক বিধানটি না হচ্ছে ততোদিন দেশীয় বিধানে আমাদের খুশী থাকতে হবে। আমার বিশ্বাস নতুন বিধানটি পাশের পর সমগ্র জাতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। বিধানটির আরো ১টি ভালো দিক হলো, আজো যারা শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি করছেন অচিরে তাদের সে আপত্তি আর ধোপে টিকবেনা। আজ সরকার দু'কন্যার নিরাপত্তা নিশ্চিতের মাধ্যমে শেখ মুজিবকে "দু'কন্যার সফল পিতার" মর্যাদায় ভূষিত করলো। আগামীতে যেদিন ১১ কোটি মানুষের নিরাপত্তা আওয়ামী লীগ নিশ্চিত করবে সেদিন আর শেখ মুজিবকে ১১ কোটি মানুষের "জাতির পিতা" হিসেবে মেনে না নিয়ে আর কারো কোন পথ থাকবেনা।

মুশকিল হলো, সে দিনটি আসতে হয়তো অনেক সময় লেগে যাবে।

লেখাটা শেষ করবার পর পর ঢাকা থেকে ওয়াজেদ মিয়ার ই-মেইল পেলাম। তিনি লিখেছেন, সবাই শেখ মুজিবের মেয়ের নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু শেখের জামাতার নিরাপত্তার প্রশ্নটি কারো মাথায় আসলোনা। বড় আফসোস। ❒

অটোয়া, কানাডা।

বোমাতঙ্কের বাংলাদেশ

মাহমুদুল হোসেন

বাংলাদেশ এখন বোমাতঙ্কের দেশ। শহরে বা গ্রামে যেকোনো জমায়েত বা সমাবেশে উপস্থিত হতে আমরা এখন ভয় পেতে শুরু করেছি। মানুষ বাস বা ট্রেনে চড়ার আগে আশংকিত হচ্ছে, খুব সহজে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে একটি পরিত্যক্ত পলিথিন বা কাপড়ের থলি দেখা গেলে। ভয়টা বোমার, এমন শক্তিশালী বোমার যা উড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে পারে ঘরের ছাদ, মানুষের হাত-পা-মাথা-মগজ সব কিছু। যে মানুষ ঘর ছেড়ে বাইরে যাচ্ছে সে ভয় পাচ্ছে, যারা ঘরে থাকছে তারা উদ্বেগে তিলে তিলে ক্ষয় হচ্ছে। এ এক অসুস্থ সময়ে, আতঙ্কিত স্বদেশে আমাদের করুণ বসবাস।

আমার মনে পড়ে আশির দশকের শেষ আর নব্বই দশকের শুরুর দিককার ওদিল-ী শহরের কথা। আমরা যখন যেতাম প্রতিবেশী দেশের সেই রাজধানীতে, কেবলই মনে হতো এমন অন্তরীণ পরিবেশে, এমন স্থায়ী আতঙ্কের মধ্যে কীভাবে বাস করে মানুষ! শিশুদের স্কুলে পাঠিয়ে উৎকণ্ঠার ভেতর রয়েছেন অভিভাবকরা, বাজারে কিংবা হাসপাতালে যখন তখন ছড়িয়ে পড়ছে বোমাতঙ্ক। শহরের রাস্তায় হঠাৎ শুরু হয়ে যাচ্ছে ছুটোছুটি, পড়ে থাকা কোনো জিনিসকে বোমা ভেবে ভীত-সন্ত্রস্ত সবাই। জীবন প্রায় থেমে পড়ার জোগাড় যেন বা। আজ আমাদের স্বদেশে আমরা ক্রমশ অমোঘভাবে সেদিকেই এগিয়ে চলেছি। এ বক্তব্যকে কারো কাছে দায়িত্বহীন মনে হতে পারে, কেউ ভাবতে পারেন এ সময়ে এরকম ধারা মত প্রকাশ কেবল আতঙ্কই বাড়াবে। কিন্তু আমাদের ধৈর্য ধারণের সম্বল কোথায়? একের পর এক বোমা হামলা হচ্ছে, যারা করছে এসব হামলা তাদের ক্রমাগত সাফল্যে তুষ্ট এবং উৎসাহী হবার কারণ দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে আমরা কাগজে লিখি আর না-ই লিখি মানুষের মনে আতঙ্ক জমাট বাঁধছে। মাত্র গেল কদিনের ঘটনা বিবেচনা করা যাক। ঢাকা মেডিকেল কলেজে পর পর কদিন ক্লাস বন্ধ থাকলো বোমা আছে কোথাও এ গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমাতঙ্ক দেখা দিল একইভাবে, পুলিশ এবং শেষে সেনাবাহিনীর লোকজন এসে উদ্ধার করে নিয়ে গেল বস্তুটি যাকে বোমা ভাবা হচ্ছে। এখনও জানা যায়নি বস্তুটি আসলে বোমা কিনা। ব্রিটিশ কাউন্সিলে ফোন করে কে যেন বললো বোমা আছে সেখানে কোথাও, যার রিমোট ডিটোনেটর রয়েছে তার নিজের কাছে, আর দশ লাখ টাকা না দিলে সে ফুটিয়ে দেবে বোমা। দুপুরে এ লেভেল পরীক্ষা ছিল, বাতিল করতে হলো সে পরীক্ষা। পুরো কম্পাউন্ড খালি করে পুলিশ তন্নতন্ন করে খুঁজে পেল না কিছুই। এই সপ্তাহেই, কর্মোপলক্ষে এক বহুজাতিক কোম্পানিতে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখা গেল এলাহি কাণ্ড! নির্দিষ্ট পূর্ব নির্ধারিত সূচী ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না, সূচী থাকলেও সাক্ষাৎকার দানকারি ব্যক্তিটিকে ইন্টারকমে তার চেয়ারে না পাওয়া যাওয়া পর্যন্ত ভেতরে যেতে দেয়া হচ্ছে না। অতএব ছোট্ট অভ্যর্থনা কক্ষটিতে মানুষে মানুষে গাদাগাদি, বিশৃঙ্খল পরিবেশ। বিড়ম্বনার চূড়ান্ত এ কারণে যে, এমনিতে প্রতিষ্ঠানটির এসব নিয়ম-কানুন অত প্রবল নয় এবং আমাদের মত নিয়মিত যাতায়াতকারিরা শিথিল, বন্ধুসুলভ বিধিতেই অভ্যস্ত। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, সিলেট শহরে একই ধরণের বোমাতঙ্ক দেখা দিচ্ছে। সব মিলিয়ে এ এক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী পরিস্থিতি।

বোমা ফাটানো হচ্ছে নিয়মিত বিরতিতে এবং যারা এটা করছে তারা কার পক্ষে আর কার বিপক্ষে তা অত্যন্ত স্পষ্ট। একথা বলা মাত্র আমরা উৎসাহী হয়ে উঠবো সম্ভবত এমন ভেবে যে, এবার বোঝা যাবে এ লেখক কোন পক্ষের, আওয়ামী লীগ না জাতীয়তাবাদি দলের! এটা এখন এদেশে ভাবনার প্রকৃতি, আম জনতা আর বিদগ্ধ জন - সকলের। আমরা দলাদলির বাইরে কিছু ভাবতে রাজি নই, তাতে ঘর পুড়ে যাক, নিজের সন্তান বাড়ি না ফিরুক, আসলে এটা একটা যৌথ মানসিক বিকলন আমাদের। এই দলাদলির চিন্তা উপেক্ষা করে বলি বোমা হামলাকারিরা আমাদের অস্তিত্বের বিরোধী। তারা চাইছে আমরা আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়ি, আমাদের শিক্ষা, পেশা, উৎপাদন, সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ুক। তারা আমাদেরকে একটি মেরুদণ্ডহীন, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীতে পরিগণিত করতে চায়। যা আমাদের সহজাত, যা আমরা আনন্দিত চিত্তে গ্রহণ করি, যার সাথে আমাদের নাড়ির যোগ, যা আমাদের গৌরবের, যা আমাদের ঐতিহ্যের অংশ সেইসব উপাদানের সাথে আমাদের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা তাদের লক্ষ্য। এই ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজক হতে পারে কারা? এমন কেউ যারা বর্তমান ক্ষমতাসীন দলকে বিড়ম্বিত করতে চাইছে, নাকাল করতে চাইছে সরকারকে? এটা করে তারা কী ক্ষমতায় যেতে পারবে - ক্ষমতায় গিয়ে কী তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এই সর্বনাশা আগুন? অথবা তারা শেষ পর্যন্ত একটি ধ্বংসস্তূপের শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে কেমন করে বহন করবে এর দায়? নাকি এরা ক্ষমতাসীনরাই, যারা মূল বিরোধীদের কিছু কৌশলগত ভুলকে পুঁজি করে তাদেরকে চূড়ান্তভাবে বিব্রত করতে চাইছে? কিন্তু তাদের জন্য এ কী আগুন নিয়ে খেলা নয় আর রাষ্ট্র-ক্ষমতার অধিকারী হিশেবে এরকম বিপর্যয়ের মূল দায় কী তাদের ওপরই বর্তায় না? এই কথাগুলো এজন্য বলা যে, সহজ বুদ্ধিতে আমি বুঝতে পারি না কীভাবে মূল রাজনৈতিক দলগুলো এই অশুভ প্রবণতায় সম্পৃক্ত হতে পারে। কিন্তু একথা সম্ভবত সত্য যে, আমাদের মূল রাজনীতির মধ্যে ঋণাত্মক স্রোত যথেষ্ট প্রবল এবং এই স্রোতের আনুকূল্যে আমাদের অস্তিত্ব বিরোধী এই সব অপশক্তি নিজেদের জায়গা করে নিতে পারে। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরি যে, একটি শহরের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করতে চায় একটি প্রতিক্রিয়াশীল চক্র। তারা বোমাবাজির সিদ্ধান্ত নিল অথবা তাদের নাটের গুরুরা, যারা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের সাথে সম্পৃক্ত, তাদের নির্দেশেই এই বোমা হামলার সিদ্ধান্ত হলো। এরা স্থানীয় একটি দুস্কৃতকারী জোটের

সাহায্য নেবে, যারা ধরা যাক, চোলাই মদের ব্যবসা করে এবং প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এরা, এই মদ্য ব্যবসায়ীরা সহজেই এই মারণ-ষড়যন্ত্রে যোগ দেবে। দেখা গেল, এরা মূল দুই রাজনৈতিক দলেরই আশ্রয় আশা করে। এইভাবে যে, একটি দলে তারা অতি সম্প্রতি ভাল চাঁদা দিয়েছে এবং অপর দলটির স্থানীয় নেতার হয়ে একটি জমিজমা সংক্রান্ত ভায়োলেন্সে অংশ নিয়েছে। উদাহরণটি বাস্তবে হয়তো আরো জটিল বা সরল হবে। কিন্তু আমাদের মূল অস্বস্তি যেখানে তা একই থেকে যাবে। তা হলো এই যে, রক্তাক্ত ঘটনাটি ঘটে যাবার পর মিথ্যাচার আর প্রতারণামূলক কথায় আমরা নিমজ্জিত হবো, পরস্পরকে দোষারোপ অশিক্ষিত গ্রাম্য ঝগড়ার পর্যায়ে নামবে, অপরাধীরা ধরা পড়বে না, নিরুপায় আমরা আরেকটি বোমা হামলার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবো। কবে কোথায় যেন এক বিদগ্ধ আলোচনায় শুনেছিলাম যে, জাত-পাতের পার্থক্য না থাকায়, একশৈলিক জাতি হবার কারণে আমাদের দেশে আদর্শের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকর করা খুবই দুরূহ কাজ। যতদূর মনে পড়ে সৈয়দ মুজতবা আলী ফরাসীদের সম্পর্কে একই ধরণের মন্তব্য করেছিলেন। আমরা এই সমস্যা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং তার অব্যবহিত পরে। স্বাধীনতার পক্ষে-বিপক্ষে পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব, আত্মীয়তা, বৈবাহিক সম্পর্ক, ব্যবসায় এসবের সম্পর্কে জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করা গেল কই? সেই দায় আজো বইতে হচ্ছে, তারও চেয়ে বড় কথা আজো একই জীবনাচরণে অভ্যস্ত আমরা, বাংলাদেশের মানুষেরা। আমরা রাজনীতি করি না, দল করি। কাজেই ব্যবসার ধান্দা করার সময় অক্লেশে ভুলে যেতে পারি আমার দলের কথা, দলাদলির বেশি তো সে কিছু নয়! অতএব সন্ত্রাসীদের মদদ দিতে আমি - আপনি দুজনেই দাঁড়িয়ে যেতে পারি এক কাতারে, আমাদের দল আলাদা হলেও, কারণ আমাদের ব্যবসায় হয়তো এক। সেখানে আমাদের অভিন্ন স্বার্থ।

আজ বাংলাদেশের রাজনীতিতে বোমা হামলার যে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে তা আমাদের এই দলাদলির সংস্কৃতি নিয়ে বিশেষভাবে ভাবিত করে তুলছে। এই সব হামলার যারা পরিকল্পনাকারী তাদের কাছে আমাদের দুর্বলতার এসব হিশাব অতি পরিষ্কার। তারা সমষ্টিক তত্ত্বের চেয়ে আনুবীক্ষণিক পর্যায়ে বিরাজমান বাস্তবতাকে মূল্য দিচ্ছে বেশি এবং সেই বিবেচনায় কাজ করে সাফল্য অর্জন করছে। বিগত দুবছরে সংঘটিত বড় বোমা হামলাগুলোর মামলাসমূহের সাম্প্রতিক অবস্থা তুলে ধরছি। আমি পেশাদার সাংবাদিক নই, এসব তথ্যের জন্য পত্র-পত্রিকার ওপর নির্ভর করতে হয়। কাজেই এসব তথ্য সম্পূর্ণ নির্ভুল এমত নিশ্চয়তা দিচ্ছি না, তবে এমন ভুল হয়তো থাকবে না যা মূল বিষয়টিকে বিপথে পরিচালিত করতে পারে।

এ বছর ২০শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানে সিপিবির সমাবেশে যে বোমা হামলা হয় তাতে সাত জনের মৃত্যু হয়েছিল, আহত হয়েছিলেন আরো পঞ্চাশ জন। এ সংক্রান্ত মামলায় পুলিশ এ পর্যন্ত এগার জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে এবং একজনের স্বীকোরোক্তিমূলক জবানবন্দী রেকর্ড করেছে। তারা এখন বলছে যে, মিরাজ নামে একজনকে খোঁজা হচ্ছে যাকে না পাওয়া গেলে নাকি ষড়যন্ত্রের মূল হোতাদের ধরা যাবে না। পুলিশ অবশ্য যশোরের উদীচী সম্মেলনের বোমা হামলা সংক্রান্ত মামলায় চার্জশিট দিয়েছে। এ মামলার কার্যক্রম উচ্চতর আদালতের নির্দেশে একাধিকবার স্থগিত থাকার পর অতি সম্প্রতি শুরু হয়েও হতে পারছে না সরকারি বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ের অভাবের কারণে। রমনা বটমূলে দুমাস আগে ঘটা বোমা হামলা সংক্রান্ত মামলায় এ পর্যন্ত বারো জন গ্রেফতার হয়েছে, তবে যে গতিতে তদন্ত চলেছে তাতে উৎসাহী হবার কারণ অতি সামান্য। দু'সপ্তাহ আগে গোপালগঞ্জের বানিয়ারচরে এক গির্জায় বোমা হামলায় দশ জন মারা গেছেন। এই ক্ষেত্রে পুলিশী তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে তেমন কিছু অবহিত হওয়া যাচ্ছে না। দু'বছর আগে খুলনায় এক কাদিয়ানী মসজিদে বোমা হামলায় সাতজন মারা গিয়েছিলেন। পুলিশ এ মামলায় এখনও চার্জশিট দিতে পারেনি। গত ১৭ই জুন নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ অফিসে বোমা হামলা হলো, মারা গেলেন বাইশ জন। পুলিশী তদন্ত শুরু হয়েছে, কয়েকজন গ্রেফতার হয়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয়, এসব বোমা হামলা বিষয়ে আমরা ঘটনার গভীরে কিছুই জানছি না। কারা এসবের মূল হোতা, তারা কি ধরণের দেশীয় নেট ওয়ার্ক ব্যবহার করে, দেশের বাইরে কোথায় তাদের ঘাঁটি, কোথায় তাদের খুঁটির জোর এসব বিষয়ে আমাদের সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য দেয়া হচ্ছে না। যতদূর মনে হয় আগাম কোনো ধারণা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না কোথায় কখন হতে পারে পরবর্তী হামলা। এমনকি এসব হামলা মোকাবেলায় কোনো আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন কিনা - এ বিষয়েও কোনো বক্তব্য নেই। এ এক অদ্ভুত হাল ছেড়ে দেয়া অবস্থা যেন বা। এ সময়কালে প্রধান বিরোধী দল আন্দোলনের নামে নাওয়া খাওয়া ভুলে যাচ্ছে, কিন্তু রাজনাতির এই সন্ত্রাসী মাত্রায়নের বিষয়ে তারা বিশেষ চিন্তিত এমন বলা যাবে না। এই প্রবণতা, দুইদলেরই, সেই দলাদলির রাজনীতির ফল। কোনো বিষয়ে একটি আদর্শগত বা নৈতিক অবস্থান গ্রহণের যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলেছেন, এই মতই শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হয়।

স্পষ্ট করে বলা যাক, এইসব নাশকতার নায়কেরা ধর্মের মুখোশ পড়ে আমাদের সর্বনাশ করতে নেমেছে। এরা বাড়ছে গোকুলে, আমাদের অদূরদর্শিতার দুধে-ভাতে। এদের সংগঠিত হবার ক্ষেত্রগুলোর পৃষ্ঠপোষক আমাদের রাষ্ট্র। ধর্মশিক্ষার নামে তারা সেখানে কী করছে তা আমরা জানতে চাইনি কোনো দিন, আজো চাইনা, কেউ চাইলেও পারবে না। এও আমাদের ওই দলাদলির রাজনীতি আর ভোটের বৈশ্য যোগ-বিয়োগ হিশাবের করুণ ফল। এর সাথে প্রযুক্ত হয়েছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা। আজ ভাবলে বিস্মিত হতে হয় উদীচীর মত আমাদের দ্বিতীয় কোনো সংগঠন নেই। এমনকি উদীচীর কার্যক্রমও জেলা শহর বড় জোর থানা স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত, গ্রাম পর্যায়ে নেই কোনো উদ্যোগ। ধর্মের নামে মিথ্যাচার করে যে ঋণাত্মক জীবনবোধ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে মানুষের মধ্যে তাকে সফল ভাবে নিরাকরণ করতে পারতো সুস্থ সংস্কৃতির প্রবাহ। সে প্রবাহ গ্রামগুলোতে আমরা চালিত করতে পারিনি। এ আরেক ট্র্যাজেডি আমাদের! আমরা, মধ্যবিত্ত শিল্পজনেরা লোক-সংস্কৃতির বীজ নিয়ে এসে নাটকে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, চলচ্চিত্রে ফলবান বৃক্ষ ফলিয়েছি, তার সুফল দেশি নাগরিক হাটে আর বিদেশের মেলায় বিক্রি করেছি, যশ আর বৈভবে ধনী হয়েছি। কিন্তু প্রাণ জাগানোর মত নতুন কিছুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিইনি লোকজ মানসকে। সেখানে দারিদ্র্য আর অশিক্ষা স্থায়ী বাসা বেঁধেছে, ধর্মের ব্যবসায়ীদের নির্মম লক্ষ্য ভেদের শিকার হয়েছে সেইসব শূন্য মন। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা একই রকমের। তিন রকম শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে আমাদের দেশে। ইংরেজি মাধ্যমে যে শিক্ষা তা

আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য কিছু দক্ষ জনশক্তি তৈরি করছে। এই সব স্কুলের ভাল ছাত্র যারা তাদের মধ্যে কোনো ভৌগোলিক রাষ্ট্রের বিষয়ে কোনো আবেগ কাজ করার কারণ নেই। কোনো ইতিহাস, কোনো ভাষা, কোনো সাহিত্য, কোনো সঙ্গীতকে নিজের মনে করে গর্বিত বা আবেগায়িত হবার কারণ নেই। ইংরেজি ভাষা, প্রযুক্তি অথবা ব্যবসায় প্রশাসনের মত বিষয়ে সবিশেষ দক্ষতা অর্জন এবং বিশ্ব-বাজারে সবচেয়ে ভাল চাকুরিটি হস্তগত করা এদের জীবনের চরম লক্ষ্য। এ বিষয়ে দ্বিমতের অভাব হবে না, তবে আমার এই সিদ্ধান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতাজাত, ঢাকা শহরের সবচেয়ে নামকরা ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোর কিছু শিক্ষক, অনেক কটি কিশোর-কিশোরী যারা এসব স্কুলে পড়ে এবং তাদের অভিভাবকদের সূত্রে আমার এই অভিজ্ঞতালাভ। মূল বিষয়ে ফিরে এসে বলি, দেশে কোথায় বোমা ফাটলো, কি বাংলা নামের সংস্কৃতির গোড়া ধরে কেউ টান দিল - তাতে এদের কিছু এসে যায় না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আরেক প্রান্তে আছে মাদ্রাসা শিক্ষা। বলেছি আগেই নাশকতার নায়কেরা সেখানে কী শিক্ষার আয়োজন করছে, কী ভয়ঙ্কর দক্ষতায় নষ্ট করে দিচ্ছে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের মাথাগুলো আমরা তার কিছুই জানতে পারি না। আর মাঝখানে আছে আমাদের বাংলা মাধ্যমে সরকারি স্কুল টেক্সট বোর্ডের শিক্ষা কার্যক্রম। সে এমনই প্রাণহীন, অনাধুনিক এবং অযোগ্য হাতে পরিচালিত যে, সে কোনো আলোই ছড়ায় না। প্রতিবারই এরকম ট্র্যাজেডির পরপর সুধী মহলে বাংলা মাধ্যমে আধুনিক, যুগোপযোগী বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে আলোচনা হয়, এবার রমনা বটমূলের ঘটনার পরও হয়েছে এবং ইতোমধ্যে আলোচনাটি থেমেও গেছে, বোধ করি। এমন বিদ্যালয় স্থাপন একদিনের কাজ নয়, একজনের কাজও নয়। লেগে থাকার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অনেকে মিলে এগিয়ে এলেই এ কাজ সম্ভব। আর একদিনের কারবারী যারা তারা এমনিতেই আগ্রহ পাবেন না একাজে, কারণ, এর ফল হাতে হাতে পাওয়া যাবে না, অপেক্ষা করতে হবে এক প্রজন্ম।

আমার রাজনীতি বিষয়ে লিখবার কথা, সে দিকে ফিরে এসেই এই নিবন্ধ শেষ করবো। আমাদের রাজনীতি কী তবে এমন অন্ধকারে নির্নিমিষ তলিয়ে গেছে যে তার আর কোনো পরিত্রাণ নেই? এমত সিদ্ধান্ত করতে দ্বিধা হয়। যারা এসব নিরাশার কথা ঝেড়ে ফেলে তৃতীয় স্রোতের রাজনীতির কথা বলেন তাদের দিকেই তবে দৃষ্টি ফেরাতে হয়। সেখানে মূল যা সমস্যা তা হলো সিদ্ধান্তহীনতা আর নিষ্ক্রিয়তা । সিপিবি'র সমাবেশে বোমা হামলার পর পরিচিত কিছু বামপন্থী বন্ধু সে রাতেই একটি পোস্টার ছেপেছিলেন। তাতে বড় বড় হরফে শেখ হাসিনার কাছে বোমা হামলার জন্য জবাব দাবি করা হয়েছিল। আমার তখন মনে হয়েছিল সরকার প্রধান হিশেবে শেখ হাসিনার কাছে আমরা নিরাপত্তা দাবি করতেই পারি, কিন্তু মূল শত্রুকে আমরা চিনতে ভুল করবো কেন? সেই পোস্টারে সবচেয়ে বড় করে আমাদের বলা দরকার ছিল সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কথাগুলো। আমরা মানুষকে জাগাতে চাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, অসুস্থ, ভায়োলেন্ট রাজনীতির বিরুদ্ধে, ধর্ম-ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে। ক্ষুব্ধ এবং হতাশ উভয় প্রকার বাম রাজনীতির মানুষকে বলতে শোনা যায় এসব ঘটনা যে তাদেরই ইন্ধনে ঘটছে না তা কেমন করে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে। এই তারা হলেন আওয়ামী লীগ আর বিএনপি। যে সূক্ষ্ম ভুলটা তারা করেন তা হলো এই যে, দলাদলির রাজনীতির শিকার এই বড় দলগুলি জটিল সামাজিক রসায়নের প্রক্রিয়ায় এসব ঘটনায় জড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু তারা এসবের নিয়ন্তা নয়। তারা ব্যবহৃত হয়, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্থানীয় ঘটনার ঘোলা জলে নাকানি চুবানি খায়, কখনও ব-্যাকমেইলড হয়। এসব কথা তাদের প্রতি সহানুভূতির প্রকাশ নয়, দেশপ্রেমিক মানুষের মূল শত্রু চেনার একটি প্রচেষ্টা মাত্র।

এইসব বড় দল আমাদের অস্তিত্বের এই সংকটকালে কাণ্ডারীর ভূমিকা নেবে এমন আশা আর নেই। আমরা এমন অনেকে আছি যারা এরকম ঘটনার পর মুখ শুকনো করে শোক মিছিলে যাই, গণ অনশন করি, ভাবি কেউ আরো বড় কিছু করলে তাতে হয়তো যোগ দেয়া যেতো। আমাদের রাজনীতিতে এখনও যারা সুস্থতার কথা ভাবেন, যেমন ধরা যাক এগার দলের মত বাতাবরণটি, তারা কী ভাববেন কিছু করার কথা। কেবল মাত্র রাজনীতির হাত ধরে তারা সম্ভবত বেশি দূর যেতে পারবেন না। কারণ রাজনীতি উপরি কাঠামোর ব্যাপার, সেখানে তারা পা ফেলে শক্ত মাটির ওপর দাঁড়াবার মত অবস্থানে নেই। ভেতর থেকে কাজ করে রাজনীতিকে সুস্থ করার দায়টা তাদের নিতে হবে। সংস্কৃতি আর শিক্ষাই হতে পারে তাদের হাতিয়ার, সংস্কৃতিকর্মী আর সুশীল সমাজের একটি অংশকে তারা হয়তো পেতে পারেন কাছেই, এ কর্মোদ্যোগে। ❒

ঢাকা
২৩.০৬.২০০১

নতুন প্রজন্মের জন্য বিশেষ বিভাগ
'ছোটমনিদের পাতা'

পাঠকদের মতামতের উপর ভিত্তি করে নতুন প্রজন্মের জন্য 'পড়শী'র একটি বিভাগ চালু হচ্ছে আগামী সংখ্যা থেকে

এ বিভাগে প্রকাশিত হবে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা ছড়া, কবিতা, রচনা ইত্যাদি

এ বিভাগটির মাধ্যম হবে মূলত: ইংরেজী

ছোটমনিদের লেখা প্রকাশের জন্য অতিসত্ত্বর আমাদের কাছে পাঠানোর অনুরোধ জানানো হচ্ছে

লেখা ছাড়াও ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কৃতিত্বের সংবাদ (ছবিসহ) পাঠাতে পারেন

লেখা ও সংবাদ মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে

লেখা ই-মেইল, ডাক অথবা ফ্যাক্স যোগে পাঠাতে পারেন